# সবুজ ইস্তাহার

পরিবেশ নিয়ে ভাবনা

সবুজের অভিযান

বর্ষ : ২ সংখ্যা ৭ সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১০ দাম ২ টাকা


## বুক চিরে পাথর দিলাম

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়

পাথরের সঙ্গে মানুষের আদিম সম্পর্ক। সভ্যতার উন্মেষপর্বে পাথরই মানুষের একমাত্র গ্রহণযোগ্য অস্ত্র। আগুন আর পাথরের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষ তার সভ্যতার বিকাশ ঘটায় যা আজও একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক। প্রাচীন প্রস্তরযুগ, নতুন প্রস্তরযুগ, ধাতুযুগ পেরিয়ে নতুন নতুন ছন্দে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে। তবু আজও পাথরের প্রয়োজনীয়তা সভ্যতার প্রাণ থেকে অবসর গ্রহণ করেনি। গুহাবাসী মানুষ আজ বহুতল বাড়ি করে আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্ন দেখছে, একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে দ্রুত ধেয়ে যাবার জন্য পথ তৈরি করছে, রেলপথ থেকে আরম্ভ করে বিস্তৃত রাজপথ সবই পাথরের বুননে সৃষ্টি হচ্ছে। এক কথায় বলতে গেলে পৃথিবী জুড়ে পাথরের সাম্রাজ্য। আদি অকৃত্রিম পাথর আজও মানুষের চাহিদা মেটাতে অন্যতম প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ।

পাথরকে ভেঙে ব্যবহৃত সম্পদে তৈরি করার কলাকৌশল মানুষ ধীরে ধীরে রপ্ত করেছে। গুহাবাসী মানুষ পাথরের বুকে ছবি এঁকেছে আবার এই পাথর দিয়েই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য তাজমহল। কোনারকের সূর্য মন্দির থেকে আরম্ভ করে অজন্তা ইলোরা সহ পৃথিবী জুড়ে পাথর দিয়ে তৈরি করা প্রাসাদ বা শিল্পের শেষ নেই। পাথরের ভাস্কর্য নিয়ে সাহিত্যের উপজীব্য হয়েছে, কিন্তু এই পাথরের খননকার্য বা ব্যবহার করার প্রক্রিয়াতে নিযুক্ত শত লক্ষ শ্রমজীবী প্রান্তিক মানুষের ইতিহাস, আজও লেখা হয়নি। সাম্প্রতিক কালে বীরভূমের মহম্মদ বাজারের পাথর খাদানের ঘটনা সেই একই উপেক্ষিত পর্বের এক নতুন সংযোজন।

পাথরের ব্যবহারের জন্য পাহাড় ভেঙে বা খননকার্য করে মাটির তলা থেকে পাথর ব্যবহার যোগ্য করার কলাকৌশল মানুষের আদিম প্রযুক্তির অঙ্গ। এই পাথরে কাজ করা শ্রমিকেরা সভ্যতার প্রথম স্তরে প্রায় প্রত্যেকেই ক্রীতদাস ছিলেন। মানুষ মানুষকে দাসে পরিণত করার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি সভ্যতার আদি পর্বে দেখা যায়। গ্রিস থেকে রোম-মিশর, পারস্য থেকে চিনে, ভারত থেকে ইউরোপের সর্বত্রই ক্রীতদাস প্রথা ছিল এবং নির্মম বঞ্চনা আর নিগ্রহের মধ্য দিয়ে ক্রীতদাসরা খনিতে কাজ করত। এই খনি থেকেই আদিম পেশাগত রোগ সিলিকোসিসের জন্ম। অনাহারে, অর্ধাহারে, পেশাগত রোগে পাথর শ্রমিকদের মৃত্যু ছিল এক অনিবার্য সত্য। সভ্যতার অগ্রগতিতে গুহাবাসী মানুষ চাঁদে হাঁটছে, মঙ্গলগ্রহে পাড়ি দেবার তোড়জোড় করছে, জিন প্রযুক্তি সহ আণবিক প্রযুক্তির দিকে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু ইতিহাস অপরিবর্তিত হয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে পাথর শ্রমিকদের দুর্দশার নিকষ কালো মেঘ।

এখন থেকে বেশ কয়েকবছর আগে ঝাড়গ্রামের অদূরে চিচুরগেরিয়া নামে একটি গ্রামে একটি পাথর কলের শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সাময়িকভাবে হলেও কিছুটা আলোড়ন উঠেছিল। ঝাড়গ্রামের দামাল ছেলে বর্তমানে প্রয়াত বিজন ষড়ঙ্গী 'কোয়ার্ক' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা চালাতেন। তাঁরাই প্রথম ঝাড়গ্রামের চিচুরগেরিয়া গ্রামে পাথরকলে কর্মরত শ্রমিকদের মৃত্যুর খবর পাদপ্রদীপে নিয়ে আসেন। নাগরিক মঞ্চ নামে একটি সামাজিক সংগঠন বিষয়টিকে সুপ্রিম কোর্টে টেনে নিয়ে যান এবং তারপরের ইতিহাস ভারতবর্ষের শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন পর্বের সৃষ্টি করে। সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুযায়ী পাথরকলের মালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে পাথরকলের মৃত ও অসুস্থ শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বিপজ্জনক শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার কথা নীতিগতভাবে ঘোষণা করেন।

সুপ্রিম কোর্টের আদেশ জারি হল। পাথর শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা দেবার বেশ কিছু আইন প্রণীত হয়েছে, পাথর কল বা পাথরের খনি থেকে পাথর উত্তোলন বা পাথর ভাঙার ক্ষেত্রে দূষণ নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাপনার নীতিও ঘোষিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আইনের কার্যকারিতা বা বিচারবিভাগীয় আদেশ রূপায়নের চিত্র অত্যন্ত করুণ।

বীরভূমের মহম্মদবাজারের দুটি ব্লক যথাক্রমে মহম্মদবাজার, রামপুরহাট-১ স্থানে অসংখ্য পাথরকল বা চলতি ভাষায় পাথর

এর পর দুইয়ের পাতায়

একের পাতার পর

খাদান সৃষ্টি হয়েছে। এই পাথরের উপর নির্ভর করছে কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের গৃহনির্মাণ, রাস্তাঘাট তৈরি, রেলপথ বিস্তৃতি সহ নদীর বা সাগরের বাঁধ। মহম্মদবাজারের এলাকাগুলি মূলত আদিবাসী অধ্যুষিত এবং এখানে মানুষ সম্পূর্ণভাবে কৃষি ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা সন্ধান দিলেন মহম্মদবাজারের মাটির তলায় আদিম ও অকৃত্রিম সভ্যতার অগ্রগতির অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ পাথর লুকিয়ে আছে। ফলত উন্নত পরিকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে সরকার বাহাদুর এগিয়ে এল জমি দখল করতে। আদিবাসীদের জমি জিরেত, বন জঙ্গল খাদানে পরিণত হল। বসে গেল সারি সারি পাথর ভাঙার কল। সবুজ হারিয়ে গেল। প্রাকৃতিক নিয়মে বয়ে চলা জলের ধারা হারিয়ে গেল। জেগে উঠল বড় বড় পাথরের কল। অন্ধকারাচ্ছন্ন খাদান আর তার সঙ্গে সহযোগী হিসাবে যুক্ত হল শব্দ আর পাথরের ধুলো। আদিবাসীদের শক্ত-সমর্থ শরীরগুলো বাঁধা পড়ল পাথরকল বা খাদানের গহ্বরে। বছর যায়। দেখতে দেখতে আদিবাসীরা ওদের সংস্কৃতি হারাল, জমি হারাল, পরিণত হল কতগুলি সংখ্যায়। খাদানের মালিক, পাথরকলের মালিকেরা ওদের নাম দিল সংখ্যাতে। রামু মুর্মু হয়ে গেল নথিভুক্ত ৩৩৬ নম্বর শ্রমিক।

ওদের দেহের ঘাম আর রক্তে হাজার হাজার টন পাথর উন্নততর সভ্যতার অগ্রগতিতে ব্যবহৃত হল। কিন্তু ওরা নেই রাজ্যের মানুষ। অন্ন নেই, বস্ত্র নেই, জল নেই, শিক্ষা নেই। আছে কেবল ছন্নছাড়া জীবন আর গ্লানিময় মৃত্যুর প্রতীক্ষা। মহম্মদবাজারের পাথর শ্রমিকের ইতিহাস ভারতের পাথর শ্রমিকদের সামগ্রিক চিত্রের একটি খণ্ড চিত্র মাত্র। সাংবিধানিক ভাবে আদিবাসীরা সুরক্ষিত, কিন্তু মহম্মদবাজারের পাথর শ্রমিকের জীবনে সাংবিধানিক সুরক্ষা ব্রাত্য।

এসব কথা কখনোই শেষের কথা হতে পারে না। অলঙ্ঘনীয় বাস্তিলও ভেঙে পড়ে, সূর্য যেখানে অস্ত যায় না সেই সাম্রাজ্যও কালের স্রোতে ভেসে যায়। মহম্মদবাজারের আদিবাসী মানুষগুলো শেষ যুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দিকচক্রবালে তাদের প্রতিবাদের দামামা বেজে উঠেছে। মহম্মদবাজারের এক আদিবাসী শ্রমিক উন্নত নাগরিকদের কাছে এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয় — বুক চিরে পাথর দিলাম, জমি খোয়ালাম, সম্ভ্রম হারালাম, আমরা কী পেলাম?

## গঙ্গা দর্শন

সর্বাণী রায়

"সেই আমাদের পুরোনো গঙ্গাতীর — এই তীর ছেলেবেলায় আমাকে কতদিন কী গভীর আনন্দ দিয়েছে। ধীরে ধীরে যখন সেই শান্ত সুন্দর নিভৃত শ্যামল শোভা দেখি আর এই উদার গঙ্গার কলধ্বনি শুনি তখন আমার সমস্ত মন একে আঁকড়ে ধরে, ছোট শিশু যেমন মাকে ধরে। আমি আমার জীবনের কতকাল যে এই নদীর কাছ থেকে বাণী পেয়েছি, মনে হয় সে যেন আমি আমার জন্মজন্মান্তরেও ভুলব না।"

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভানু সিংহের পত্রাবলী।

কবিগুরুর লেখাটি যেন আমার ছোটবেলার প্রতিদিনের যা আমাকে মানসচক্ষে সেই হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোকে নতুন করে প্রত্যক্ষ করায়। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে ঋতুপরিবর্তন এর সাথে গঙ্গার রূপের নানান বৈচিত্র্য আমাকে আজও মুগ্ধ করে। গ্রীষ্মের 'দারুণ অগ্নিবাণে' তপ্ত, বর্ষার 'শ্যামল সুন্দর' বারিধারায় স্নাত, 'শীতের হাওয়ায়' শান্ত শীতল গঙ্গার অপরূপ দৃশ্য আজও ভুলতে পারি না।

ছোটবেলায় খেয়া পারাপার করতে যখনই গঙ্গার ঘাটে গেছি, দেখেছি নদীতীরবর্তী কালো ধোঁয়ার ধ্বজাধারী কলকারখানাগুলি কীভাবে নির্বিচারে কালো তরল বিষ গঙ্গার বুকে ঢেলে দিয়ে নিজেকে মুক্ত করছে, কত মানুষ চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন নাগরিকের মত যাবতীয় আবর্জনা নির্দ্বিধায় নদীপাড় ও তার পবিত্র জলে ফেলে নিশ্চিন্ত হচ্ছে। এ ছাড়াও, শহরের নিকাশি নালা ও অন্যান্য ছোট-বড় নালা এবং গ্রামের শস্য খেত থেকে আগত দূষিত তরল বর্জ্যের যাত্রাপথও মিশেছে গঙ্গার স্রোতে। নদী আমাদের গোটা দেশ ও তার মানব-সভ্যতাকে নিজের অফুরন্ত প্রাণশক্তি দিয়ে সমৃদ্ধ করেছে। তার ওপর মানুষের এই অকথ্য অত্যাচার ক্রমশ বাড়তে বাড়তে এক ভয়ানক রূপ ধারণ করেছে। যে গঙ্গার অপরূপ সৌন্দর্য আমি প্রতি মুহূর্তে উপভোগ করেছি, তার এই কলুষিত করুণ রূপ খুবই পীড়াদায়ক।

কবিগুরুর অভিজ্ঞতাতেও নদীর প্রতি মানুষের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারের প্রতিধ্বনি শোনা যায় - '..... গঙ্গা দিয়ে যখন আমাদের জাহাজ আসছিল, তখন বণিক্‌জাতির নির্লজ্জ নির্দয়তা নদীর দুই ধারে দেখতে দেখতে এসেছি। ওর মনে প্রীতি নেই বলেই বাংলাদেশের এমন সুন্দর গঙ্গার ধারকে এত অনায়াসে নষ্ট করতে পেরেছে।'

বর্তমানে, মানব-সভ্যতার দ্রুত উন্নতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে গঙ্গার পক্ষে অশনিসংকেত হয়ে দেখা দিয়েছে। স্বার্থলোলুপ মানব সমাজ পরিবেশের গুরুত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে নানাবিধ উন্নতিমূলক কার্যকলাপে যেভাবে মেতে উঠেছে তারই পরিণতি - জলবায়ু পরিবর্তন। গঙ্গাও জলবায়ু পরিবর্তনের রক্তচক্ষু থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারেনি। তাই তার অস্তিত্বের সঙ্কট দেখা দিয়েছে। 'Up in Smoke - Asia and the Pacific' নামক আই.পি.সি.সি.-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিজ্ঞানীদের আশঙ্কা, জলবায়ু পরিবর্তনের মাত্রা এভাবে চলতে থাকলে, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে গঙ্গার উৎস তথা হিমালয়ের হিমবাহ প্রায় ৮০ শতাংশ কমে যেতে পারে। আমেরিকা মহাদেশের 'ন্যাশনাল সেন্টার ফর অ্যাটমোস্ফিয়ারিক রিসার্চ'-এর

এর পর তিনের পাতায়

পূর্বের পাতার পর

**একটি** সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, সারা **পৃথিবীর প্রায় ২০০টি** নদীর **মধ্যে** গঙ্গার সবচেয়ে দ্রুত হারে **জল-সংকোচন ঘটছে** যার ফলে আগামী ৫০ বছরের মধ্যে **নদীটির জলরাশির সম্পূর্ণ** রূপে নিঃশেষিত হবার একটি ভয়ংকর **সম্ভাবনা প্রকট** হয়ে চলেছে।

জীববৈচিত্র্যের **নিরিখেও গঙ্গার** গুরুত্ব অপরিসীম। একসময় এই গঙ্গা-ই ছিল **পৃথিবীর একমাত্র** নদী যা প্রায় ১৪০টি প্রজাতির মাছ, ৯০টি **প্রজাতির** উভচর প্রাণী এবং বিভিন্ন ধরনের পরিযায়ী ও **অন্যান্য পাখির** নিরাপদ বাসস্থান। অথচ একটি সাম্প্রতিক গবেষণাতে **বিজ্ঞানীরা** জানিয়েছেন,যে সমস্ত প্রজাতির মাছ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় নদীর জল পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে, তারাই আজ বিলুপ্ত হতে চলেছে। অপরদিকে, শুশুক (গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন, যাকে কেন্দ্রীয় বন ও পরিবেশ মন্ত্রক দ্বারা 'জাতীয় জলজ প্রাণী' এবং ১৯ জানুয়ারি, ২০১০ এ বন্যপ্রাণী (সুরক্ষা) আইন, ১৯৭২ অনুযায়ী সিডিউল-১ এ পরিগণিত করা হয়েছে) আজ সমূলে ধ্বংস হবার জোগাড়। এই **সব কিছুর** জন্য দায়ী গঙ্গায় মিশ্রিত কলকারখানা থেকে নিরন্তর দূষিত তরল, নিক্ষাশিত আবর্জনা, শস্য খেতের কীটনাশক দূষিত জল, এমনকী পচাগলা মৃত দেহাবশেষজনিত জল দূষণ।

গত ১ এপ্রিল ২০১০ মহা হিসাব নিয়ামক ও (হিসাব) নিরীক্ষক (Comptroller and Auditor General, (CAG ) মতানুসারে, উত্তরাখণ্ড সরকার যদি গঙ্গার দুই শাখা নদী - অলকানন্দা ও ভাগীরথী উপর ৫৩টি জলবিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ার সিদ্ধান্তে অনড় থাকে, তবে এই নদী দুটি জলশূন্য হয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে।

বাঙালির জাতীয় উৎসব দুর্গা পুজো। উৎসবের আনন্দঘন চারটি দিন অতিবাহিত হলেই মহা দশমী তথা বিজয়া দশমী। আর এই **অত্যন্ত** শুভ দিনটি-ই গঙ্গার জন্য এক মহা অভিশাপ - নদীতে মায়ের **বিসর্জন** ডেকে আনে গঙ্গার জলের শুদ্ধতা ও পবিত্রতা বিসর্জনের **আর একটি** অন্যতম কারণকে। প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় বিসর্জিত **পুজোর দ্রব্য** সামগ্রী, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ, মূর্তির কাঠামোর খড়, বাঁশ ও রং এবং **সর্বোপরি** মাটির মূর্তিতে ব্যবহৃত সিসা ও ক্রোমিয়াম যুক্ত রং মারাত্মক জলদূষণ ঘটায়। এছাড়াও, মূর্তির কাঠামো নদীর স্রোতে বাধার সৃষ্টিও করে থাকে। পরিবেশবিদদের মতে, প্রত্যেক বছর দেব-দেবীর মূর্তি গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়ার ফলে জলদূষণ বহুগুণে বেড়ে **যায়।**

**নানাবিধ দূষণের** কবল থেকে গঙ্গাকে রক্ষা করতে ১৯৮৫ সালে তৈরি **হয় 'গঙ্গা অ্যাকশন** প্ল্যান।' দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রথম দুটি পরিকল্পনা ব্যর্থ **হবার পর, দেশের** সাতটি আই আই টি, যথা কানপুর, মুম্বাই, গুয়াহাটী, **দিল্লি, খড়্গপুর, চেন্নাই** এবং রুরকি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং **কেন্দ্রীয় মন্ত্রকটি** তাদের 'জাতীয় গঙ্গা নদী অববাহিকা কর্তৃপক্ষ' (National Ganga River Basin Authority )-এর জন্য আগামী ১৮ মাসের মধ্যে একটি কার্য পরিকল্পনা তৈরি করতে বলে। এই পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থনীতি বিষয়ক মন্ত্রী পরিষদীয় সমিতির গত ১০ জুন ২০১০ 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান'-এর দ্বিতীয় স্তরে ৪৯৬.৯০ কোটি টাকার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

কর্মসূত্রে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সাথে যুক্ত হয়ে যখন জানলাম গত ২০০৭ সাল থেকে গঙ্গাকে কলুষমুক্ত করতে সরকারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে পর্ষদ 'নির্মল গঙ্গা অভিযান' নামক একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে, তখন আমার প্রিয় নদীর সেই মহিমান্বিত অপূর্ব শোভা ফিরে পাওয়ার আশা নতুন করে দানা বেঁধে উঠল। এই কর্মসূচির অন্যতম বিষয়বস্তু বা লক্ষ্য হল জনসচেতনতা। এই উদ্দেশ্যে বিভিন্ন নির্দেশিকা গঠিত হয়েছে, যা অনুসরণ করা খুবই সহজ যদি আমাদের মননশীলতা, সচেতনতা ও নদীটির প্রতি একটু আন্তরিকতা জাগরিত হয়।

দিনান্তে মনে ভাবি, আজ আমাদের এমনই দুর্দশা ঘটেছে যে, নিজেদের জাতীয় নদীকে বাঁচাতে কাগজে লেখা ক'টি কড়া নিয়মকানুনই একমাত্র সম্বল, অন্যথা, মা গঙ্গার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তবে দুঃখ পাই, যে নদীর জল কলকারখানার অন্যতম প্রধান রসদ হিসাবে ব্যবহৃত হয়, স্বার্থপর ব্যবসায়ীরা চরম অকৃতজ্ঞের মত তাকেই ক্রমাগত দূষিত করে চলেছে। নদীতে অতিরিক্ত পলি সঞ্চয়ের সঙ্গে তার নাব্যতা ক্রমহ্রাসমান। যে পবিত্র গঙ্গার জল ব্যতীত দেব-দেবীর আরাধনা বা যে কোনও ধরনের ধর্মীয় অনুষ্ঠান সাধিত হয় না, তাকেই বোধ-জ্ঞানশূন্য মানুষ নিজের হাতে অপবিত্র করে চলেছে। স্রোতস্বিনী নদী কুদর্শন পূতিগন্ধময় খালের সমতুল হয়ে উঠেছে। আমাদের দৈনন্দিন নানাবিধ অনৈতিক কর্ম আজ আমাদের সকলের জন্য চরম দুর্ভাগ্য বয়ে এনেছে। আমাদের জীবনীশক্তির ধারক-বাহক গঙ্গা, আজ নিজেই দূষণ ভারে জর্জরিত, ক্লান্ত, শ্রান্ত।

গঙ্গার এহেন দৈন্যদশা সর্বতোভাবে মানুষেরই দান। এ যেন তার জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ, আর আমাদের বিবেক জাগরিত হবার চরম মাহেন্দ্রক্ষণ! সময় এসেছে, পতিতপাবনী নদীকে কলুষমুক্ত করার সদর্থক!! প্রচেষ্টা করে প্রকৃত অর্থে নিজেদের পাপস্খলন করার। পরিবেশপ্রেমী কবিগুরুর মতে '.....এই গঙ্গা এক সময়ে যেমন ভারতের সাধনার ক্ষেত্র ধীরে ধীরে বিস্তারিত করেছিল, তেমনি তার এক দিক দিয়ে সে তার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর করেছিল। সেইজন্য গঙ্গার প্রতি মানুষের এত শ্রদ্ধা ......।' তাই এই কথা ক'টি মনে রেখে, যাবতীয় আইন-কানুনের ঊর্ধ্বে গিয়ে আমাদের জোটবদ্ধ হতে হবে গঙ্গা নদীর হারানো মহিমা ফিরিয়ে দিতে। তাকে সর্বাত্মকভাবে রক্ষা করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হতে হবে। এই হবে আমাদের জাতীয় তথা প্রিয় নদীর প্রতি আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।

এর পর চারের পাতায়

তিনের পাতার পর

# সুন্দরবনের নদীগুলির চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে

কমলবিকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। সেই সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে বাসভূমির চাহিদা। কোথায় পাওয়া যাবে এত বাসভূমি? কেন? অরণ্য রয়েছে। কেটে ফেল গাছপালা। তৈরি কর নতুন নতুন শহর। সেখানে থাকবে শুধু ইট, কাঠ, বালি দিয়ে তৈরি সুউচ্চ অট্টালিকা। ঝাঁ চকচকে রাস্তা। তার উপর দিয়ে ছুটবে অসংখ্য গাড়ি। ছড়াবে কার্বনডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদি লাগামহীন দূষণ।

শুধু নগরায়ন হলেই তো হবে না! সেখানে যারা বাস করবে তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের কথাও তো ভাবতে হবে। তার জন্য একটু-আধটু পরিবেশ দূষণ ঘটতেই পারে। তাতে মহাভারত এমন কিছু অশুদ্ধ হবে না।

সত্যিই কি তাই? নগরায়নের প্রয়োজনে ইটের জোগান দিতে নদীকে বেঁধে তৈরি হচ্ছে একের পর এক ইট ভাটা। মানুষের আকাশচুম্বী চাহিদা মেটাতে গজিয়ে উঠছে একের পর এক কলকারখানা। এর ফলে প্রতিনিয়ত যে দূষণ ঘটছে তার মাত্রা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে তার হিসেব আমাদের জানা নেই। পরিবেশবিদরা এ নিয়ে চেঁচামিচি করলেও জনসাধারণের মধ্যে এ ব্যাপারে তেমন কোন হেলদোল নেই বললেই চলে। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। পরিবেশ বিপর্যয়ের ভয়ঙ্কর পরিণতিগুলি এক এক করে আমাদের সামনে ভেসে উঠছে।

কিছুদিন আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক সুন্দরবনের নদীগুলির উপর এক সমীক্ষা চালান। সেই সমীক্ষার ফল সম্প্রতি কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'এনভিরন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সেখানে বলেছেন, সুন্দরবনের নদীগুলোর চরিত্র ধীরে ধীরে পাল্টে যাচ্ছে। নদীর জলে নুনের পরিমাণ বাড়ছে। বাড়ছে অম্লভাব। আগের তুলনায় অনেক বেশি উষ্ণ হয়েছে নদীর জল। বেশি মাত্রায় পলি মেশার ফলে নদীর স্বচ্ছ জল ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে উঠছে। এর ফলে নদীর জলে জন্মানো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এককোষী তৃণ ফাইটো প্ল্যাঙ্কটনের চরিত্র পাল্টে যাচ্ছে। কেন এমন হচ্ছে? এর কারণ উল্লেখ করতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন :

১) কলকাতা, হাওড়া ও হলদিয়া শহরের দ্রুত প্রসার ঘটছে।

২) নদীতে বাঁধন দিয়ে যথেচ্ছ ইট ভাটা তৈরি হচ্ছে।

৩) কলকারখানার বর্জ্য নদীর জলে মিশছে। এছাড়াও সেখান থেকে নির্গত কার্বনডাইঅক্সাইড গ্যাস নদীর জলে মিশে জলে অম্লভাব বাড়াচ্ছে।

৪) হুগলি নদীর মিষ্টি জল সুন্দরবনের নদীগুলিতে কম ঢুকছে।

৫) নগরায়ন যত বাড়ছে, গাছ কাটা হচ্ছে তত বেশি। ফলে ভূমিক্ষয় বাড়ছে। মাটি ধুয়ে নদীর জলে মিশছে। নদীর জল ঘোলাটে হচ্ছে। জলের স্বচ্ছতা কমছে।

৬) নদীর জলে যে সব প্ল্যাঙ্কটন কম পরিমাণে জন্মাত, সেগুলো এখন দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে।

শুধু সুন্দরবনের নদীগুলিতে নয়, সাগর, মহাসাগরের জলেও বেড়ে চলেছে অম্লভাব। এর কারণও বাতাসে কার্বনডাইঅক্সাইড-এর আধিক্য। বাতাসের কার্বনডাইঅক্সাইড জলে মেশার ফলে সমুদ্রের জলে অ্যাসিডের বাড়-বাড়ন্ত। এর ফলে সামুদ্রিক প্রাণী জগতে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। শামুকের খোলা ভঙ্গুর হয়ে উঠছে। ভূমধ্যসাগরে অনেক প্রাণী আর দেখা যাচ্ছে না। পাশাপাশি সমুদ্র থেকে অতিরিক্ত মাছ ধরার ফলে বেড়ে যাচ্ছে জেলি ফিশের সংখ্যা। এদের কিছু প্রজাতি আছে, যাদের ছোঁয়ায় মানুষের শরীরে ঘা হয়। ভূমধ্যসাগরের কূলে একরকমই এক প্রজাতির আনাগোনা বেড়ে চলেছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এতে সামুদ্রিক জীবচক্রে ওলটপালট ঘটতে পারে।

ভবিষ্যতে এইসব পরিবর্তনের ফল কী হবে এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে প্রকৃতিতে কিছু না কিছু যে পাল্টে যাচ্ছে সেটা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

# জলজ বৈচিত্র্য বনাম জলজ দূষণ

বেবি বসু (গুপ্ত)

পৃথিবীর জীবমণ্ডলের প্রথম অধিতি বৃক্ষ ধরিত্রীমাতার অনুকূল পরিবেশের স্নেহ-লাবণ্যে পরিপূর্ণ হয়ে বৃদ্ধি লাভ করেছিল। তারপর সুদীর্ঘ ভৌগোলিক যুগ পরিবর্তন, জলবায়ুর অনুকূল-প্রতিকূলতা ও প্রাকৃতিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে বৈচিত্র্যময় স্বাভাবিক উদ্ভিজ্জ। তাপন বায়ু প্রস্তুতকারী এই সবুজ মণ্ডল আজও অপরাপর সকল প্রাণীজগতের চিরদিনের 'বোবা বন্ধু'। উদ্ভিদ-ভূগোলবিদগণ নানা বিষয়ের উপর নির্ভর করে তাদের 'জৈবাঞ্চলে' বিভক্ত করেছেন। এরই একটি 'জলজ-বৃক্ষকুল' — কোন্ প্রজাতি জলে ডুবে থেকে বাঁচতে ভালবাসে মূলী রূপে বা ভাসমান অবস্থায়; কোন্ প্রজাতি জলের ধারে জলীয় আবহাওয়ায় বেড়ে ওঠে; কোন্ প্রজাতি লবণাক্ত জলকেই অনুকূল রূপে গ্রহণ করে তার জৈব-বৈচিত্র্যের প্রসর বিশাল বাস্তুতান্ত্রিক ভারসাম্য রক্ষায় পুকুরের বাস্তুতন্ত্র উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক হ্রদ ও নদীপ্রবাহ কিম্বা যে কোনও জলাশয়ে স্বাভাবিক উদ্ভিদ বৈচিত্র্য লক্ষণীয়। কিন্তু জলাশয়গুলিতে বৃদ্ধিলাভকারী সকল উদ্ভিদই কিন্তু পরস্পরের অনুকূল প্রতিবেশী নয়, কোনও কোনও প্রজাতির জলজ বৃক্ষ তাই একে অপরের শত্রু

এর পর পাঁচের পাতায়

চারের পাতার পর

হয়ে ওঠে। মানুষের অনবধানতায় বর্তমানে নাগরিক বসতি যেমন জলাশয়ের বাস্তুতন্ত্রকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে তেমনই মানুষের চোখের আড়ালে **শত্রু** জলজ উদ্ভিজ্জ ঘটায় মারাত্মক জলজ দূষণ যাকে বলা হয় ইউট্রোফিকেশন। তাই কিছু কিছু অবাঞ্ছিত জলজ বৃক্ষ প্রজাতির অবারিত বৃদ্ধি জলাশয়ের দূষণকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। কচুরিপানা, ইঁদুরকানি, ঝাঁঝি, হাইড্রিলা, রানানকুলাম প্রভৃতি জলজ উদ্ভিদের প্রভূত ও নির্বিচার বৃদ্ধি নানা পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষভাবে ও পরোক্ষভাবে জলদূষণ ঘটায়। নানা প্রজাতির বর্ণময় ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন পৃথিবীর নানা স্থানে বিভিন্ন অবস্থায় হ্রদ, নদীর জলদূষণ ঘটিয়ে জলজ প্রাণীর ক্ষতি সাধন করছে। অথচ প্রকৃতির প্রাণীবৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে তার প্রতিকার। জলজ গাছপালা জনিত দূষণ জলের ক্ষতি করে নানা ভাবে। স্বাভাবিক জলের গন্ধ-বর্ণ ও গুণের অবাঞ্ছিত পরিবর্তন জলজ প্রাণী বিশেষত মৎস্য সম্পদের বৃদ্ধিতে একদিকে সহায়ক হয়েও অপরদিকে কিছু মৎস্য প্রাণীর বেঁচে থাকার ব্যাঘাত ঘটায়। ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন-জু-প্ল্যাঙ্কটন ছোট-বড় মাছের খাদ্যশৃঙ্খল সর্বজনবিদিত। অথচ কিছু প্রজাতির ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন জলজ প্রাণী-বৈচিত্র্যের প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করে। দ্রবীভূত অক্সিজেন, স্বচ্ছতা ও তার ভারসাম্য বিনষ্ট করে; জল-ঘনত্ব, জলপ্রবাহ প্রভৃতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলে।

ইউট্রোফিকেশন কথাটির প্রকৃত অর্থ দূষণ যা প্রত্যক্ষ ভাবে নয়; এর অর্থ হল জলজ কিছু ক্ষুদ্র প্রজাতির 'অনুকূল খাদ্য খনিজের প্রভূত সরবরাহ'। **কিছু ফাইটোপ্ল্যাঙ্কটন ও অ্যালগি জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ ও বর্ণময় প্রজাতির প্রভূত বৃদ্ধি ঘটিয়ে অপরাপর বৃক্ষ-জীব-অনুজীবের ভারসাম্য বিনষ্ট করে — যার ফলে ঘটে জলজ দূষণ** প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে জলের স্বাভাবিক গুণ বিনষ্ট করে ও নানা জলজ প্রজাতির ক্ষতি সাধন করে। এই প্রভূত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত প্রজাতির এই ফলশ্রুতি 'এ্যালগি ব্লুম' নামে পরিচিত। প্রাকৃতিক কারণে এই এ্যালগি ব্লুম ঘটলেও বর্তমানে দেখা যাচ্ছে মনুষ্য-সৃষ্ট কারণটি সর্বত্র বিরাজমান।

গ্রামাঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ ফসল বৃদ্ধিতে তাৎক্ষণিক সাফল্য এনে দিলেও এর ক্ষতিকারক দিকটি সুদূর প্রসারী। কৃষিক্ষেত্রের উদ্বৃত্ত খনিজ যখন নিকটবর্তী নদী-জলাশয়গুলিতে গিয়ে মেশে তখন ঘটে কিছু বিশেষ প্রজাতির জন্য প্রভূত খনিজ-খাদ্য সরবরাহ ----- যার ফলে ঘটে এ্যালগি ব্লুম যা সমগ্র জলকে দূষিত করে। শিল্পাঞ্চলে অপরিশোধিত তরল বর্জ্য এবং নগরাঞ্চলের নিকাশী-ব্যবস্থা থেকে একই ভাবে এ ঘটনা ঘটে চলেছে। গ্রামাঞ্চলের এঁদো পুকুরের লাল, হলুদ বা সবুজ বর্ণময় জল যেমন এই ঘটনার ফল তেমনই সমগ্র পৃথিবীকে নানা গুরুত্বপূর্ণ নদী, স্বাভাবিক হ্রদের (উদাহরণ কাস্পিয়ান সাগর) জলের স্বাভাবিক রূপ পরিবর্তিত হয়ে ধারণ করছে নানা বর্ণময় রূপ। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে এই জলদূষণ যেমন সব চাইতে বেশি তেমনই উন্নয়নশীল দেশগুলিতেও শিল্পায়ন ও কৃষি-সার ব্যবহারের ফলে ঘটছে জলাশয়ে, নদী, সাগরে প্রভূত পরিমানে নাইট্রোজেন ও ফসফরাসের পরিমাণ বৃদ্ধি। এর ফলে এক শ্রেণির জলজ বৃক্ষ ও জীব যেমন বেশি বৃদ্ধি পাচ্ছে তেমনই অপর শ্রেণিগোষ্ঠী তাদের কারণেই বিনষ্ট হয়ে নির্মূল হয়ে চলেছে। ইউট্রোফিকেশন তাই জলজ বাস্তুতান্ত্রিক সুরক্ষার বিরোধীই শুধু নয়, বিনাশক রূপেই দুশ্চিন্তার কারণ। বেশ কিছু বন্ধু জলজ জৈবাঞ্চল এবং মানুষের খাদ্য তালিকাভুক্ত পুষ্টিকর মৎস্যপ্রজাতি আজ এই ধ্বংসের মুখে।

## ধন্যবাদ

অচিন্ত্য সিংহ

সেদিন সকাল থেকেই মেঘলা, আষাঢ়ের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, টিপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। পুরাতন মাটির ঘরে দরজার কোনে কুনো ব্যাঙটি চুপটি করে টিভি-র খবর শুনছে। খবর শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কুনো ঘর থেকে বেরিয়ে পাশে ডোবার কাছে - তখন ঝমঝম্ বৃষ্টি। কুনো থপ থপ করে এক হাত তুলে - কোলাদাদা - ও কোলাদাদা।

কোলা ব্যাঙ বলল, 'কে? কে আমায় ডাকে'।

— 'আমি তোমার কুনোভাই গো।

— কি এই ভর সন্ধ্যায়।

— কোলাদাদা খবর আছে, একবার উপরে এসো।

দুই ব্যাঙ এক জায়গায় হয়ে কথাবার্তা হল। বৃষ্টির রেশও অনেকটা কমার দিকে। এমন সময় এক বিরাট ধপধপে সাদা লক্ষ্মীপেঁচা ডোবার ধারে পোঁতা বাঁশের খুঁটির উপরে এসে বসল। ভয়ে ছোটাছুটি করতে লাগল অন্যান্য ছোট ছোট ব্যাঙ, ইঁদুরগুলো। বড় কোলাটা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'ও লক্ষ্মীদি, ও পেঁচাদিদি, আজ আর কোনও খাদ্য-খাদক নয়। আগামীকাল সন্ধ্যায় তুমি একবার এখানে আসবে। আমি আর তুমি মিলে প্রচারে বেরুব। লক্ষ্মীপেঁচা তখন তার ঠোঁট দিয়ে পিঠ চুলকাতে চুলকাতে বলল, তা কী প্রচার, কাদের জন্য। ব্যাঙ তার লম্বা জিভ বের করে বলল, 'কালকেই বুঝতে পারবে - কীসের জন্য প্রচার করছি। পরদিন যথাসময়ে পেঁচা এসে হাজির। কোলা ব্যাঙ তৈরি ছিল। এক লাফে পেঁচার পিঠে উঠে বসল, পেঁচা উড়িয়ে নিয়ে চলল তাকে। প্রথমে ঝি ঝি ডাক জঙ্গল, খলসে চরা বিল, খরগোশ কানন, তার পাশেই হস্তি চরা মাঠ, উত্তরে নিউ পক্ষী কানন এবং সবশেষে মজুরমুঠি ময়দানের পূর্বে টিকটিকি গিরগিটি কলোনি, তার পশ্চিমে পুটিখাক বিল। ওই বিস্তীর্ণ এলাকা

এর পর ছয়ের পাতায়

পাঁচের পাতার পর

ঘুরে সমস্ত পশুপাখি পোকামাকড়-এর কাছে গিয়ে ব্যাঙ লক্ষ্মীদিদির পিঠে চড়ে তার ওই বড়মুখে হাঁ' করে গলা ফুলিয়ে প্রচার করেছিল। ----- 'হে জীবজন্তুর কুলের সমস্ত বন্ধুগণ, পরশু সন্ধ্যায় অভয় সরোবরের কাছে মুক্তকাননে 'ধন্যবাদ' নামে এক সভা ডাকা হয়েছে। তোমরা সকলেই ওই সভায় উপস্থিত থাকবে। ওই সন্ধ্যায় খাদ্য-খাদক চলবে না।'

ছোট্ট টুনটুনি এক লাফ দিয়ে ওড়ে। এক দম্পতি শালিককে বলছে, "ও দাদা বৌদি, শুনলে তো ব্যাঙ দাদার কথা, ওই ছোট্ট মুক্ত কানন, ওখানে আমাদের সকলের জায়গা হবে? পাশে থাকা এক কাঠবিড়ালি চিড়িক চিড়িক ছুটে এসে বলল, 'চুপ কর তো, জানিস না কিছু। তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে লেজ তুলে বসে বলছে - 'আমরা কাঠবিড়ালিরা টিকটিকি গিরগিটি ছোট আকারে পাখিরা সবাই পাশের গাছগুলোতে বসব। খরগোশ, শিয়াল, বেজি, ভাম ওই জাতীয় প্রাণী ও সর্পকুল মুক্ত কাননে শান্তভাবে বসে আলোচনা শুনব।

পরের দিন যথা সময়ে সভার কাজ শুরু হল। সারাদিন ছিল মেঘলা কাটা ঝলমলে রোদ। জীবজন্তুর সভাতে আমন্ত্রিত ছিল মনুষ্যজাতির আদি পূর্বপুরুষ দুই মহল্লা থেকে দুই হনুমান। উত্তর মহল্লা মহাশক্তিবীরজি, দক্ষিণ মহল্লার পালোয়ান অনন্তজি।

মঞ্চ তৈরি করেছিল উঁইপোকা, শালিক, পাতিকাক ও অন্যান্য পাখিরা মিলে। আগেই বলা আছে এখানে কোন খাদ্য-খাদক নয়। আজকে সকলেই আমরা ভাই ভাই। চারটি উঁইপোকার ঢিবির চেয়ার করা আছে। কোলা ব্যাঙ থপ থপ করে লাফিয়ে মঞ্চে উঠে দুই বীরজির নাম ঘোষণা করাতে তারা হুপ হুপ শব্দে বীরের ভঙ্গিতে ছোট ছোট লাফে উঁইঢিবিতে সুসজ্জ কাঠপাতাতে সাজানো বসার জায়গাতে আসন গ্রহণ করল।

দম্পতি টিয়া, দম্পতি ময়না উড়তে উড়তে গিয়ে দুই বীরকে ফুলের মালা পরিয়ে অতিথি বরণ করল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ মহলে হাততালি, পক্ষীকুলের ডানার ঝাপট ও কাঠবিড়ালির চিড়িক চিড়িক আওয়াজে সভাস্থল মুখরিত হল। এ-দিকে প্রায় সূর্য ডুবু ডুবু - আঁধার নামছে। জোনাকিরা তাদের শূন্য পাওয়ারের শরীরবাতি নিয়ে হাজির। এর মাঝেই এক গোখুর সাপ ফণা তুলেছে। তা দেখে ছোট ছোট ব্যাঙ ইঁদুররা ছোটা ছুটি, লাফালাফি করত লাগল, একটা গণ্ডগোল শুরু হল। নিমেষের মধ্যে এক স্বেচ্ছাসেবক দোয়েল ফুরুত করে উড়ে গিয়ে মঞ্চে বসা কোলাদাদাকে ঘটনাটা বলল। কোলা বলল, 'ওটা কিছু না'। কোলাব্যাঙ সাথে সাথে গলা ফুলিয়ে চিৎকার করে শোনাতে লাগল। আজ আর কোন খাদ্য-খাদক নয়। আপনারা ভয় পাবেন না। আজ বড় আনন্দের দিন। ব্যাঙদাদা এক হাত তুলে মাঝে মাঝে লাফিয়ে আরও উচ্চস্বরে বলতে লাগল ---- মঞ্চে উপবিষ্ট মনুষ্যজাতির দুই আদিপুরুষকে আমরা প্রণাম জানাই। সবাইকে আমার ভালোবাসা জানাই। আজ আর কোনও মানুষ আমাদের ধরে মেরে বিদেশে চালান করে দেবে না। কারণ আমি বলছি ......। তখুনিই ব্যাঙ-এর কথার রেশ ধরে লক্ষ্মীপেঁচা বলল, 'আমাদেরকেও মানুষরা ধরে মেরে বিক্রি করে। কাকের কা কা কা শব্দে জানাল --- আমাদের স্বধর্মীয় পক্ষীকুল শকুন, তারা আর এ দেশে নেই। হয়তো বেঁচেও না থাকতে পারে। আমরা তো মানুষের উপকার করি নোংরা খেয়ে। ওদিকে মঞ্চের পিছনে ইঁদুর আর মৌমাছি স্বেচ্ছাসেবক টিফিন নিয়ে রেডি। কোলাব্যাঙ এক বড় লাফে একটা উঁচু উঁই ঢিবিতে উঠে আরও চিৎকার করে বলছে, বন্ধুগণ, আপনারা শান্ত হন। আজ থেকে মানুষরা আমাদেরকে মারবে না, ধরবে না। কারণ মানুষের স্বার্থেই সমস্ত জীবকুল বাঁচানো দরকার। সমস্ত উদ্ভিদজগৎ ও জীবজন্তু না বাঁচলে মানুষের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে। এই ২০১০ বর্ষকে রাষ্ট্রপুঞ্জ 'জীববৈচিত্র্য বর্ষ' হিসাবে ঘোষণা করেছে। তাই আমরা মানুষকে ধন্যবাদ জানাই।

## আমাদের প্রকাশিত বই

১. ল অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (১৯৯২)।
২. দ্য ইগনোরড্ এনভায়রনমেন্ট, উপেক্ষিত পরিবেশ (১৯৯৮)।
৩. রণনীতি ও রণকৌশলের ইতিহাস (২০০৩)।
৪. অধ্যাপক প্রফুল্ল কুমার চক্রবর্তী : ফিরে দেখা (২০০৩)।
৫. পরিবেশ (২০০৩)।
৬. ধূসর বসুধা (২০০৫)।
৭. এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়েকনিং (২০০৫)।
৮. এত আঁধার কেন (২০০৮)।
৯. প্রসঙ্গ : যুদ্ধ ও পরিবেশ (২০০৮)।
১০. প্রসঙ্গ : মানবাধিকার ও পরিবেশ (২০০৮)।
১১. শিকড়ের সন্ধানে: হুগলি জেলা (২০০৯)।
১২. ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম : ফিরে দেখা (২০০৯)।
১৩. জলবায়ু পরিবর্তন : এক অশনি সংকেত (২০০৯)।
১৪. সবুজ বিশ্বের শান্তির অধিকার (২০১০)।

স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক : পরিবেশ আকাদেমি, সবুজের অভিযান, বড়বাজার, চন্দননগর - ৭১২১৩৬। সম্পাদক : রাহুল রায়।
যোগাযোগ : ৯৪৩৩২৭৫৩৬৪; ৯৮৩৬২০৮০০৩ ই-মেল : rayrahul2263@yahoo.co.in